বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

রাজনৈতিক-অর্থনীতি

উপমহাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপ্তি ও বিবর্তন

সাজ্জাদ জহির | ০০:০০:০০ মিনিট, সেপ্টেম্বর ০৩, ২০১৫

‘বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থনীতি’ শিরোনামে প্রথম পর্ব গত বৃহস্পতিবার প্রকাশ হয়। এ পর্বে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সেসবের বিবর্তন সম্পর্কে উল্লেখ করব। একই সঙ্গে সমকালীন বিবিধ উদ্যোগ উল্লেখের মাধ্যমে পরিবহনের গণ্ডি পেরিয়ে যোগাযোগের (বিষয়) ব্যাপ্তির দিকগুলো খোলাসা করব। এ উন্মোচন প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রাথমিক ইঙ্গিত থাকবে।

সনাতনী যোগাযোগ ব্যবস্থা: সিল্করুট একটি পরিচিত নাম। নির্দিষ্ট এ পথ দিয়ে চীনা সিল্ক বাণিজ্যের আধিক্য থাকায় এর নামকরণ এবং পথটি হিমালয় পর্বতমালার উত্তর দিয়ে চীনের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর উপকূলকে সংযুক্ত করেছিল। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ফলে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠীর পণ্য নিয়ে নানা পথ সিল্করুটের মূল পথটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এ উপমহাদেশের তেমনই একটি পথের নাম কটন বা তুলা রুট, যা ঔপনিবেশিক (অবিভক্ত) ভারতে কলকাতার অদূরে ক্যানিং বন্দর থেকে উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় (বর্তমান) পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ও আফগানিস্তান হয়ে সিল্করুটের সঙ্গে যুক্ত হয়। বহুদিন আগে থেকেই শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশ থেকে সংগৃহীত মসলা ও ধূপদ্রব্য ইউরোপের পথে পাড়ি দিত। এরও বহু আগে মৌর্য রাজাদের সময় গঙ্গার পাড়ে গড়ে ওঠা জনপদগুলোকে সংযুক্ত করে যে ‘উত্তরপথ’ তৈরি হয়েছিল, তা শেরশাহের সংক্ষিপ্ত জীবদ্দশায় ‘গ্র্যান্ড ট্রাংক’ রাস্তা হিসেবে পুনর্নির্মিত হয়। হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের এ পথ উত্তর ভারতে দিল্লির মসনদকেন্দ্রিক সাম্রাজ্য গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। পক্ষান্তরে ১৮৭০ সালের ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতবর্ষে ক্যানিং থেকে এলাহাবাদ-দিল্লি-লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথটি নির্মিত হয়েছিল মূলত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে।(১) নীল (ইন্ডিগো), পাট, কার্পাস তুলা, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের আকর্ষণ সেসময়কার যাতায়াত ব্যবস্থার বিন্যাস নির্ধারণ করেছিল। কথিত আছে, ১৮৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উতপাদনে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটলে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় দেশগুলো তুলার বিকল্প উতস খুঁজতে ততপর হয় এবং তার ফলেই ভারতে রেললাইন সম্প্রসারণে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের আগ্রহ জাগে।

১৯০৯ সালের মধ্যে পূর্ব ভারতীয় রেল নেটওয়ার্ক ফরিদপুর পেরিয়ে বিস্তৃত হলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ) সঙ্গে বর্তমান ভারতের উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমের সরাসরি কোনো রেল যোগাযোগ ছিল না। সেসময়ে (আনুমানিক ১৯২০-২৫ অবধি) অরুণাচল প্রদেশ থেকে আসামের বদরপুর হয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে সম্পদ বিদেশে নেয়া হতো এবং পূর্ব ভারতের অন্যান্য পণ্য চলাচল মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক হতো। তবে ১৯৩১ সালের রেল মানচিত্রে দেখা যায়, তত দিনে শিলিগুড়ি-দার্জিলিং দিয়ে পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।(২) ‘চিকেন নেক’ কথিত এ পথে বদরপুর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলঘেঁষে দিনাজপুর-বিহার সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমমুখী এ রেললাইন উত্তর ও পশ্চিম ভারতকে অধিক খনিজসম্পদ প্রাপ্তির সুযোগ করে দেয়। কিছুটা কাকতালীয় মনে হলেও লক্ষণীয় যে, ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ক্ষণকালের (১৯৩৮-৩৯) জন্য সুভাষ বোসের আবির্ভাব ঘটলেও কংগ্রেসকেন্দ্রিক ভারতীয়

রাজনীতির কর্তৃত্ব এলাহাবাদ ও পশ্চিম ভারতীয় পুঁজির স্বার্থ রক্ষাকারীদের (প্রতিনিধি) হাতে চলে যায়!

ভারত ভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে রেল ও নদীপথই ছিল যাতায়াতের মূল মাধ্যম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কারণে রেলপথে সেবার মানে অধোগতি ঘটে, নদীপথ সংকুচিত হয় এবং ক্রমাগত হারে সড়কপথের বিস্তৃতি ঘটে।(৩) ষাটের ও সত্তরের দশকে পাবলিক ওয়ার্কস কর্মসূচি ও 'কেয়ার'-এর মাটির রাস্তা ধীরগতিতে গ্রামীণ জনপদকে সংযুক্ত করছিল। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে ঢাকাকেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হতে দেখা যায়। আশির দশকে সড়ক নির্মাণ ও সড়ক উন্নয়নে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ ঘটে, যা ক্রমান্বয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার সংযুক্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলে সড়ক পরিবহনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়; গাড়ি, বাস ও বিভিন্ন আকারের ট্রাকের চাহিদা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে। ঢাকাকেন্দ্রিক এ উন্নয়ন যেমন বাংলাদেশী সত্তাকে সুদৃঢ় করে, একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সন্ধানে আসা মানুষের ভিড়ে সুস্থ উন্নয়ন ধারা ব্যাহত হয়। সংযুক্তি (কানেক্টিভিটি) বৃদ্ধির ফলে নিঃসন্দেহে স্থানীয় পণ্যের উতপাদক, শ্রমের বিক্রেতা ও শহুরে ক্রেতাসাধারণ উপকৃত হয়েছে। ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমির দাম বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে যারা আইনি বা বেআইনিভাবে সে জমির মালিকানা পেয়েছিল। সড়ক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে আরো লাভবান হয়েছে পরিবহনে ব্যবহৃত গাড়ি, বাস ও ট্রাক বিক্রেতা বা আমদানিকারক কিংবা প্রস্তুতকারক এবং সেগুলোতে ব্যবহৃত জ্বালানির সরবরাহকারীরা। সম্ভবত সে কারণেই রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণে জাপানি ঋণের আধিক্য দেখা গেছে, যা অনেক সময় বিশ্বব্যাংকের মতো বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমেও এসেছে। ২০১৪ সালের হিসাবে জাপান থেকে বাংলাদেশের মোট আমদানির ১৫-২০ শতাংশ খরচ হয় (রেল, ট্রাম ও যন্ত্রাদি ব্যতীত) যানবাহন আমদানিতে। একই উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঋণের আবির্ভাব গত এক দশকে দৃশ্যমান, যদিও সে দেশে প্রস্তুত অটোরিকশা, বাস ও ট্রাকের আধিক্য বাংলাদেশের রাস্তায় বহুদিন। অতি সম্প্রতি চীনা বাসের আমদানি নিয়ে অনেক গুঞ্জন শোনা গেছে, যদিও সেতু ও বন্দর নির্মাণে এবং রেল-ইঞ্জিন রফতানিতে চীনের আগ্রহ অধিকতর।

যোগাযোগের সম্প্রসারিত রূপ: সনাতনী যোগাযোগ ব্যবস্থার আলোচনায় গ্রিড লাইনে বিদ্যুত্ সরবরাহ ও পাইপলাইনে গ্যাস (বা জ্বালানি তেল) সরবরাহ সাধারণত স্থান পায় না; যদিও বিগত দেড় দশকে আঞ্চলিক সংযুক্তির আলোচনায় এ বিষয় দুটো প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে জ্বালানি আছে, সেখান থেকেই সরবরাহ লাইনের শুরু। কিন্তু লাইনের শেষ মাথা জানিয়ে দেয় কোথায় এ সম্পদ ব্যবহার করা হবে অর্থাত্ কোথায় উতপাদনধর্মী বিনিয়োগ আশা করা হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে পশ্চিম বাংলার বহরমপুর হয়ে ভেড়ামারা সংযোগস্থল দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুত্ আমদানি করছে এবং এর অবকাঠামোটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণে নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্যে জানা যায়, এ প্রাথমিক সংযুক্তি পদ্মা সেতু পেরিয়ে (ভারতের) আসামের শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তবে এ পথের মূল লাইনটি সীমান্ত পেরোবে কুমিল্লা দিয়ে এবং ২০১৫ সালের ৩১ মার্চের একনেক বৈঠকে কুমিল্লা-ত্রিপুরা বিদ্যুত্ সংযুক্তি প্রকল্পটি সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর সে পথে বিদ্যুত্ আমদানি শুরু হয়েছে। বর্তমানের বিদ্যুত্ আমদানি দেখে মনে হতে পারে, বাংলাদেশই গন্তব্য, যেখানে আগামীতে উতপাদনমুখী বিনিয়োগ ঘটবে। কিন্তু নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের এ জাতীয় লেনদেনের ইতিহাস দেখে মনে হয়, আগামীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুত্ উতপাদন শুরু হলে এবং পদ্মা সেতু দিয়ে গ্রিড স্থাপন হলে (সোয়াপ অর্থাত্ দ্রব্য বা সেবা বিনিময়ের আওতায়) একই পথে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিদ্যুত্ রফতানি হবে। ক'দিন আগে ভারতের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত পশ্চিম বাংলার দক্ষিণে অবস্থিত সাগর দ্বীপে নতুন সমুদ্রবন্দরের খবর ও নৌঘাঁটি স্থাপনের কানাঘুঁষাটি যদি সত্য হয়, তাহলে চাহিদা মেটাতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে বিদ্যুত্ প্রবাহ বিপরীতমুখী হওয়া অসম্ভব নয়। (৪)

আঞ্চলিক বিদ্যুত্ সংযুক্তির অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি হলো, হাইভোল্টেজ ডিসি বা এসি লাইন দিয়ে অরুণাচল প্রদেশের জলবিদ্যুত্ আগ্রা অবধি পরিবহন। এ আঞ্চলিক গ্রিডটি অরুণাচলে শুরু হয়ে আসামের বনগাঁইগাঁও, বাংলাদেশের জামালপুর অথবা বড়পুকুরিয়া ও বিহারের পূর্ণিয়া দিয়ে আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ভুটানের বিদ্যুত্ বনগাঁইগাঁওতে মিলবে এবং নেপালের বিদ্যুত্ পূর্ণিয়ায় পশ্চিমমুখী গ্রিডটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা। বড়পুকুরিয়ায় উতপাদিত বিদ্যুত্ এ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশ্চিমমুখী হবে, নাকি তা দক্ষিণমুখী হয়ে বাংলাদেশের অন্যত্র বিদ্যুত্ জোগান দেবে, সেটা স্পষ্ট নয়। তবে ২০৩০ সালের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী প্রায় ৩ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট পরিমাণ (মোট প্রাপ্তির ৯ শতাংশ) বিদ্যুত্ আঞ্চলিক গ্রিড থেকে আসার কথা। অবাক হওয়ার নয় যে, ভারত ও বাংলাদেশে হাইভোল্টেজ লাইনটি স্থাপনের জন্য সুইডেনের এবিবি কোম্পানি দায়িত্ব পেয়েছে (সূত্র: আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইট)।

প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি হিসেবে পরিচিত, কিন্তু পাইপলাইন বা অন্য কোনোভাবে তার পরিবহন যাতায়াত ব্যবস্থারই অঙ্গ। গ্যাস পাইপলাইনের তথ্যাদি সাধারণত রহস্যাবৃত থাকে এবং ঘটনা-পরবর্তীতে তথ্য প্রকাশ পায়। ২০১২ সালে জার্নাল অব এনার্জি সিকিউরিটিতে কেশভ চন্দ্রের লেখা একটি নিবন্ধ পড়ছিলাম— 'পাইপলাইন দ্যাট ওয়াজন্ট: মিয়ানমার, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া ন্যাচারাল গ্যাস পাইপলাইন'। নিবন্ধকার উল্লেখ করেন, মিয়ানমারের সিতওয়ে (রাখাইন প্রদেশের রাজধানী) থেকে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের ভূমি দিয়ে পাইপলাইন নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছিল। সম্ভাব্য চুক্তির স্বচ্ছতা না রেখে ১৯৯৯-২০০০ সালের দিকে আন্তর্জাতিক তেল-কোম্পানির অনেকে অবিশ্বাস্য পরিমাণ গ্যাস মজুদের ধুয়া তুলে বাংলাদেশে উত্তোলিত গ্যাস ভারতে রফতানির প্রস্তাব দেয় এবং পাইপলাইন নির্মাণের যাবতীয় খরচ বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে

দিতে চেষ্টা করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ-ভারত সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হলে এবং সেই বিলম্বকালে চীনা বিনিয়োগে শওয়ে উপকূল থেকে চীনের কুনমিং অবধি প্রাকৃতিক গ্যাসের (ও জ্বালানি তেল) পাইপলাইন নির্মাণ হওয়ায় বাংলাদেশ দিয়ে সিতওয়ের গ্যাস প্রবাহের সম্ভাবনার সমাপ্তি ঘটে। সমঝোতা ব্যর্থ হলে বাংলাদেশকে এড়িয়ে দুটো ভিন্ন পথে মিয়ানমারের গ্যাস ভারতে নেয়ার আশা ভারতীয় মহলে ব্যক্ত করা হয়েছিল। প্রথমটি বঙ্গোপসাগরের তলদেশ দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি 'কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প' নামে কথিত, যা সিতওয়ের গ্যাস কালাদান নদী বরাবর উত্তরমুখী নিয়ে মিজোরামের লাংতলাই জেলা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে, চিকেন নেক পেরিয়ে পাটনা-লক্ষ্ণৌ হয়ে পশ্চিম ভারতের পথে পাড়ি জমাবে। কিন্তু সেসব সম্ভাবনা আজ মৃতপ্রায়। গত জানুয়ারি (২০১৫) থেকে শুধু সিতওয়ে থেকে গ্যাসই নয়, মধ্যপ্রাচ্য থেকে চীনা আমদানিকৃত জ্বালানি তেল শওয়ের টার্মিনাল হয়ে পাইপলাইন দিয়ে কুনমিংয়ের শোধনাগারে পৌঁছতে শুরু করেছে। চীনকে এ সুবিধা দেয়ার জন্য মিয়ানমার সরকার ৩০ বছরে মোট ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রয়্যালটি পাবে (সূত্র: ফোর্বস ম্যাগাজিন)। সম্ভবত পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে সনাতনী পশ্চিমা স্বার্থের সঙ্গে একাত্ম প্রকাশ করে ভারত 'কটন রুট' রূপরেখার আওতায় পরিকল্পনায় নেমেছে। এ বছরের মার্চে ভারতের ভুবনেশ্বরে নয়টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ওশান: রিনিউইং দ্য ম্যারিটাইম ট্রেড অ্যান্ড সিভিলাইজেশনাল লিংকেজ' শীর্ষক সম্মেলন তারই ইঙ্গিত দেয়। মিয়ানমারে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের একটি ফলাফল সম্ভবত রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হওয়া, যারা রাখাইন জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল।

লভ্যতা হ্রাসের কারণে পানির সরবরাহ, তা পাইপলাইনে আসুক অথবা নদী-খাল (পুনঃ) খনন করে আনা হোক— যোগাযোগ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আলোচনা পূর্ণতা পাবে, যদি আঞ্চলিক পানিপ্রবাহের তথ্যাদি বিবেচনায় রাখা হয়। সে কারণেই সংক্ষেপে প্রাকৃতিক প্রবাহে বিঘ্ন ঘটিয়ে পানি সরবরাহকে ভিন্নমুখী করার দু-চারটা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করব: চীনের ইয়ারলাং য্যাংপো নদী ভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ নাম নিয়ে বাংলাদেশে যমুনা হয়ে প্রবেশ করে। জলবিদ্যুত্ পাওয়ার আশায় ভারত অরুণাচলের ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ দিচ্ছে, অথচ তারই উজানে ইয়ারলাং য্যাংপো নদীতে বছরে ২৫ লাখ মেগাওয়াট (ঘণ্টা) বিদ্যুত্ উতপাদনের লক্ষ্যে চীনাদের প্রথম প্রকল্পটি ২০১৪ সালের নভেম্বরে চালু হয়েছে। যদিও বিভিন্ন এলাকার বা দেশের বৃষ্টির পানি এ দীর্ঘ ২ হাজার ৮৮০ কিমি নদীতে প্রবাহিত হয়, উজানে বাঁধ বা ভিন্ন খাতে পানি নেয়ার উদ্যোগ ভাটিতে কি বিপর্যয় আনতে পারে? তা বাংলাদেশের জনসাধারণের বহু বছর ধরে জানা। একইভাবে ভারতীয় মহলেও শঙ্কা জেগেছে। কারণ নতুন খাল কেটে উত্তরে পানি সরিয়ে নেয়ার চীনা উদ্যোগ মোটামুটি পাকা। বাংলাদেশেরও উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা— শুধু যমুনার প্রবাহ কমবে না, তিস্তা-মহানন্দা সংযুক্তি খাল দিয়ে তিস্তার পানি পশ্চিমমুখী করে বাংলাদেশকে পানিবঞ্চিত করার কাহিনী এখন বাস্তব (https://m.youtube.com/ watch?v=fLGAlcJ6g6M)। আঞ্চলিক নদীর পানি ভাগাভাগি নিয়ে আরো দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সুপেয় পানির উদ্দেশ্যে যেমন ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরায় ধরে রাখা প্রয়োজন, তেমনি হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে মোল্লারহাট থেকে মধুমতী নদীর পানি খুলনা শহরে বয়ে আনার প্রকল্পও বাস্তবায়নে আছে। যেহেতু জীবন নির্বাহের জন্য এবং সুস্থ উতপাদনের জন্য নিরাপদ পানি আবশ্যক, যাতায়াতের অন্যান্য ব্যবস্থার মতো পানিপ্রবাহের দিক-প্রকৃতি অনুধাবন রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণের জন্য জরুরি।

পরিশেষে তথ্য যোগাযোগের উল্লেখ করব যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইন্টারনেট ও সেলফোনের সংযোজনের অবকাঠামোর বর্ণনা দিয়ে। সেবা খাতে এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণে তথ্যপ্রযুক্তির অপরিসীম অবদান রয়েছে। যোগাযোগ বিষয়ে এর অন্তর্ভুক্তি আলোচনায় নতুন মাত্রা আনে, যা বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিরাপত্তা অবধি বিস্তৃত। অযৌক্তিক শোনালেও সত্য, স্যাটেলাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহের ওপর গুটিকয়েকের নিয়ন্ত্রণ পাশের বাড়ির সঙ্গে ফোনালাপের খরচ বহুকাল বেশি রেখেছে, অথচ বাংলাদেশে বসে সুদূর আমেরিকায় ফোন করতে অতি সামান্যই খরচ হতো। অন্যান্য যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংযুক্তি বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানের প্রবেশদ্বার বহুলাংশে ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। কিন্তু তথ্য-যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়— নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ ও প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রবেশদ্বার (গেটওয়ে) দিয়ে সব তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব এবং সে প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রকের পছন্দমতো নির্বাচিত হতে পারে এবং তা সদাপরিবর্তন করাও সম্ভব। তাই বাণিজ্যে ব্যবহৃত সমুদ্রপথ বা স্থলপথ নিয়ন্ত্রণ করে খাজনা আদায়ের বাসনা যেমন অনেক ঐতিহাসিক যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, আধুনিক তথ্যপ্রবাহের বাজার দখলের প্রতিযোগিতা সে তুলনায় কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর নেটওয়ার্ককে বিপর্যস্ত করে বিস্তৃত জনগোষ্ঠীকে নিজের নেটওয়ার্কের আওতায় আনা এ যুদ্ধের প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং এ লক্ষ্যে বাজারবহির্ভূত শক্তির আশ্রয় নেয়া স্বাভাবিক। স্যাটেলাইট পথে ও ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রতলে কেবল (তার সংযোগ) দিয়ে তথ্যপ্রবাহ ঘটে। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের সংযোগে সীমিত বেষ্টনীতে তারবিহীন রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার রয়েছে। স্যাটেলাইটের সম্ভাব্য কক্ষপথ দখলি যেমন বাস্তব, তেমনি সাবমেরিন ক্যাবল (SEA-ME-WE 5 অথবা AAE-1) বা স্থলভিত্তিক ক্যাবল সংযোগের হাবের ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতাও দৃশ্যমান। বাংলাদেশ দীর্ঘ অপেক্ষার পর SEA-ME-WE এর মাধ্যমে (কক্সবাজার দিয়ে) সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তি বেছে নেয় এবং মাত্র ক'দিন আগে (দ্বিতীয় কেবল) কুয়াকাটা দিয়ে SEA-ME-WE 5 সংযুক্তির অনুমোদনকালে এ দেশের কর্তৃপক্ষ চীনা নিয়ন্ত্রিত AAE-1 এর সংযুক্তি নেয়া থেকে বিরত থাকে।

উল্লেখ্য, ভূপৃষ্ঠের কিছু পূর্বনির্ধারিত প্রেরণ বা গ্রাহককেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাঝে তথ্য আদান-প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশের সে জাতীয় কোনো কেন্দ্র নেই। এমনকি (নির্মাণাধীন) একটি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়ে বর্তমান স্যাটেলাইট

তথ্যের বাজারে এ জাতীয় স্বতন্ত্র গেটওয়ে প্রতিষ্ঠা আর্থিক বিচারে যৌক্তিক নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। দেশীয় পরিসরে তথ্য আদান-প্রদানে আইএসপিরা প্রাথমিক ভূমিকা রাখে। দেশের বাইরে তথ্য প্রেরণের জন্য দেশে ২৬টি নিবন্ধনভুক্ত আন্তর্জাতিক গেটওয়ে কোম্পানি রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক হাব ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তথ্য সরবরাহ রোধ করা না হলেও জাতীয় ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তা কার্যকর করার চেষ্টা চলছে। এ পর্যন্ত দুটো NIX কোম্পানিকে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশের আইএসপি অ্যাসোসিয়েশন (ISPAB) তৃতীয় লাইসেন্সটি পেলে বাজার নিয়ন্ত্রণের পথ সুগম হবে কিনা, তাই এখন দেখার অপেক্ষা। আরো শোনা যায়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বৃহত্ ইন্টারনেট কোম্পানি (গুগল বা সমতুল্য) স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের সার্ভার বসিয়ে অধিক দক্ষতা অর্জনে (এবং ব্যয় হ্রাসে) সচেষ্ট। সারকথা, যেসব প্রবেশ বা প্রস্থানদ্বার (গেটওয়ে) দিয়ে এ দেশের তথ্য যাতায়াত করছে, তার ওপর সার্বভৌমের আদতেই কোনো কর্তৃত্ব আছে কিনা, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আর কর্তৃত্ব না থাকলে নজরদারির জন্য পরনির্ভরতা থেকেই যাবে। তথ্যপ্রবাহে একটি প্রবেশদ্বারের উপরেও অন্য প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা ও পরনির্ভর বাংলাদেশের পক্ষে নিকট ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় ভাবাটাই স্বাভাবিক।

ইন্টারনেটের প্রবেশদ্বার দখলের বাণিজ্যিক তাতপর্য আজকের বাজারে অভাবনীয় এবং নৈতিক সত্তার (এবং স্বকীয়তার) বিবর্তনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 'সেলবাজার ডট কম' থেকে 'এখানেই ডট কম'-এ উত্তরণ এক ধরনের উদাহরণ, যা কোনো কোনো খাতে জাতীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তির সংকেত দেয়। সংস্কৃতির বাণিজ্যকরণ সম্পর্কে আজ কারো মনে দ্বিধা থাকা উচিত নয়, বিশেষত কেবল টেলিভিশন প্রচারণায় বিধিহীনতা ও বিধি প্রয়োগের দুর্বলতা যেমন তথ্য বিকার প্রশ্রয় দিচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞাপনের দ্বারা দ্রব্য ও সেবা খাতের বাণিজ্যকেও স্বদেশবিমুখ করে তুলছে। অনস্বীকার্য যে, গ্রাহকদের পছন্দ ও বাজারে ভালো-মন্দের প্রাপ্যতা-সংক্রান্ত তথ্য 'হাব' নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অনেকাংশেই প্রভাবান্বিত করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, কোনো একদিন আপনার স্মার্টফোনে 'ওয়েদার ডট কম'-এ ঢাকার আবহাওয়ার খোঁজ নিতে যেয়ে আপনি যদি আপনার এলাকাকে 'ব্রাহ্মণকিট্টা' নামে চিহ্নিত দেখেন, অবশ্যই প্রশ্ন জাগবে, এটা কি আইএসপির কাজ, নাকি আরো সুদূরে অবস্থিত কোনো তথ্য নিয়ন্ত্রক এ খেলায় রত! আজকাল তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে স্থানীয় উতপাদক ও সরবরাহকারীদের বেমালুম অদৃশ্য করে বিদেশী দ্রব্য ও সেবাকে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। ইন্টারনেটে এলোপাথাড়ি দ্রব্যের নামভিত্তিক অনুসন্ধান করলেই পাঠকরা উপরের মন্তব্য যাচাই করতে পারবেন। মোটকথা যেকোনো সত্তার স্বকীয়তা তার অভ্যন্তরের মনন প্রক্রিয়ার অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সত্তার স্বাধীন অবস্থানের জন্য তথ্যপ্রবাহকে বিজাতীয় স্বার্থ থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। একই সঙ্গে মনে রাখা জরুরি, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় আমরা শুধু তথ্য পাই না, একই পথ দিয়ে আমরা নিজেদের ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অনেক তথ্য অদৃশ্য গন্তব্যে প্রতিনিয়ত পাঠাচ্ছি, যা আমাদের বাইরের জগতের অজানা শক্তির সহজ ক্রীড়নক করতে পারে!

টীকা: (১) সে সময়ে কলকাতা থেকে পূর্বে শুধু একটি লাইন ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানের মৈত্রী এক্সপ্রেস রুটের দর্শনা-গেদে সেই আদি লাইনেই পড়ে। (২) ১৯৩১ সালের রেল মানচিত্রে পূর্বমুখী রেল বিস্তৃতি থেকে লক্ষ করা যায় যে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে খনিজসম্পদ ব্যতিরেকে তা মূলত নীল ও পাট চাষের এলাকাগুলোকে কলকাতা/ক্যানিং ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। (৩) নদীর নাব্যতা কমে আসায় নৌ-যোগাযোগের মাধ্যমে ঢাকার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অটুট রাখা সম্ভব ছিল না এবং দ্রুততার সঙ্গে দেশকে সংগঠিত করার বিকল্প পন্থা না থাকায় এটাই সম্ভবত অনিবার্য ছিল। তবে নব্বইয়ের দশকে নৌ-পরিবহনে বিনিয়োগ দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। (৪) গত ২৯ মার্চ, ২০১৫ বিদ্যুত্ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় ২০১৫ সেপ্টেম্বরের মাঝে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন সম্ভব হবে না এবং প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৭ সালে পেছানো হয়েছে! তিনি ঘোষণা দেন, ২০২১ সালের মধ্যে ওই এলাকার ১ কোটি ৫৬ লাখ গ্রাহককে বিদ্যুত্ সংযোগ দেয়া হবে। গ্যাসপ্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যখন বিদ্যুতপ্রবাহের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, তখন মাঠ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

(নিবন্ধটির বাকি অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশ হবে)

লেখক: নির্বাহী পরিচালক

ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ (ইআরজি)

বণিক বার্তা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি ও বিষয়বস্তু অন্য কোথাও প্রকাশ করা বেআইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক: দেওয়ান হানিফ মাহমুদ

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স: ৮১৮৯৬২২-২৩, ই-মেইল: news@bonikbarta.com বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ ফ্যাক্স: ৮১৮৯৬১৯